রিসালাত আদায়ে কোরআনে বর্ণিত নবীজী সাঃ এর নাম

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার বন্ধুকে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন নেয়ামত স্বরূপ। পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم **نِعۡمَتِهِۦٓ عَلَيۡكُمۡ** وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ
بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ

"আল্লাহর রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং **তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'মাত** স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করলেন, ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নি-গহ্বরের প্রান্তে ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে তাথেকে রক্ষা করলেন। এভাবে আল্লাহ নিজের নিদর্শনাবলী তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হও।"

মুফাসসিরগণ এই নিয়ামত এর তাফসীর করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলতে চেয়েছেন নিয়ামতটি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা। যাকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে একটি নিয়ামত হিসেবে। তিনি এই উম্মতের জন্য তো বটেই, পুরো বিশ্ববাসীর জন্য একটি নিয়ামত। আরো স্পষ্ট করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন রহমাতুল্লিল আলামিন মহাবিশ্বের জন্যে রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণবাচক নামগুলো দুই প্রকার। কিছু আছে এমন গুন যা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যেই পাওয়া যায়, আর কারো মধ্যে না। যেমন আল আকিব - সর্বশেষে আসা নবী, আল হাসির - যার কারণে হাশরের ময়দানে সকলকে সমাবেত করা হবে, আল মুকতাফা- যার পরপরই কিয়ামতের ময়দানে মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে, খাতামুন নাবিয়্যিন, রহমাতুল্লিল আলামিন, সাইয়েদুল মুরসালিন, সাইয়েদু উলিদ আদাম। এই নামগুলো কেবল তার জন্যই খাস।
এছাড়া কিছু গুণবাচক নাম এমন আছে যা অন্যদের মধ্যেও পাওয়া যায়, তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়। যেমন আশ শাহিদ - সাক্ষ্যদাতা, আন নাজির - সতর্ককারী, আল মুবাশ্বির - সুসংবাদদাতা; এগুলো অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা ব্যবহার করেছেন।

ইবনুল যাওযি রহিমাহুল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ "যাদুল মা'আদ" এর ২৮ নং পৃষ্ঠায় গুণবাচক নামের এই প্রকারভেদ এনেছেন।

সূরা আহযাবের ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ **شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا**

"হে নাবী! আমিতো তোমাকে পাঠিয়েছি **সাক্ষী হিসাবে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী** রূপে।"

শাহিদ

শাহিদ অর্থ সাক্ষ্যদাতা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত পূর্বের সকল নবীদের দাওয়াত সত্য হবার সাক্ষ্য নিয়ে এসেছিলেন। তিনি এমন সময় এসেছিলেন, যখন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের নিকট আসা দ্বীন ইসলামকে বিকৃত করে আলাদা মতবাদে পরিণত করে নাম দিয়েছিল ইহুদিধর্ম, খৃষ্টবাদ। কিন্তু তাদের প্রতি প্রেরিত হওয়া অন্য সকল নবী রসূল যেমন মুসা, ইয়াহিয়া, দাউদ, সুলাইমান, ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) তারা যেই দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন তা যে সত্য দ্বীন ছিল, সেই সাক্ষ্য নিয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে এসেছিলেন। জন্য তার নাম হয়েছে শাহিদ।

আখেরাতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা এই রিসালাত সম্পর্কে দুই পর্বে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। প্রথমে সমস্ত উম্মতদেরকে তাদের নিজ নিজ নবীর মাধ্যমে সাক্ষ্য নিবেন। নবীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তারা তাদের উম্মতের নিকট রিসালাত প্রচার করেছিল কিনা? নবীরা বলবে, হ্যাঁ আমরা এই উম্মতের কাছে দ্বীনের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছিলাম। "আমাদের কাছে পৌঁছেনি" বলে তাদের উম্মতরা অস্বীকার করবে। তখন এই নবী ও রাসূলদের সত্যতা যাচাই করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপস্থিত করে বলা হবে, "আপনি সাক্ষ্য দিন, এই নবীগণ কি তাদের উম্মতের কাছে সঠিকভাবে রিসালাত পৌঁছেছিল?" তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলবেন, "হ্যাঁ এই আম্বিয়ায়ে কেরাম সকলে তাদের নিজ নিজ তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছিল।"
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য নবীদের সময়ে উপস্থিত না থাকলেও তার কাছে আল্লাহ তাআলা কুরআনে অন্যান্য নবীদের কথা ওহী পাঠানোর মাধ্যমে বলে দিয়েছিলেন। সে কুরআন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবগত হয়েছেন যে, সকল নবীগণ তাদের রিসালাত পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে কখনোই খেয়ানত করেননি।
আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা নিসার ৪১ নং আয়াতে বলেছেন:

فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدٗا

"সুতরাং তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য হতে এক একজনকে সাক্ষী উপস্থিত করব এবং **তোমাকেও হাজির করব তাদের উপর সাক্ষ্যদানের জন্য**।"

মুবাশ্বির - নাজির

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে মুবাশ্বির এবং নাজির শব্দদুটি একই সাথে এনেছেন। মুবাশ্বির শব্দটি بشير থেকে এসেছে। এই বাশারাত এর মানে হচ্ছে, আরেকজনকে ভালো কিছু জানিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর কাছে সেই ভালো কাজটির যা পরিণতি হবে, তাও জানিয়ে দেয়া। আল্লাহর আদেশসমূহ পালন ও নিষেধসমূহ বর্জনের কারণে আমাদের যে সওয়াব হবে এবং পরকালের বিনিময় কী হবে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ভালোভাবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

নাজির মানে হচ্ছে সতর্ককারী; যে ব্যক্তি, মানুষকে তার ভুল কাজগুলোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় এবং আখিরাতে যে খারাপ জিনিসগুলো তার জন্য অপেক্ষা করছে তা জানিয়ে দেয়। আল্লাহর ব্যাপারে কুফরি করা, তার নবীদের আনীত রিসালাত কে অস্বীকার করা, এসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তিনি এই কাজটি সম্পূর্ণ সফল ভাবেই সম্পন্ন করেছেন।

তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, কোন কোন কাজ গুলো আমাদের আমল নষ্ট করে দিতে পারে, কোন কোন কাজের জন্য কিরামিন কাতিবিন আমাদের গুনাহ লিখতে পারে, কী কী কারণে কবরের আজাব হয়, দুনিয়ার কাজের ভিত্তিতে আখিরাতে আমরা কে কোন বিভাগে পড়বো, দুনিয়াতে কেমন করলে কোন পর্যায়ে জান্নাত পাব, কী কারনে কেউ জাহান্নামে যাবে, কোন আমলের জন্য কোন ধরনের জাহান্নামে যেতে হবে, এসব বিষয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। সূরা সাবার ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ **بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا** وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ

"আমিতো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি **সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী** রূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা।"

এবং সূরা আহযাবের ৪৫ নং আয়াতে বলেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَ**مُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا**

"হে নাবী! আমিতো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসাবে এবং **সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে**"

দায়ী ইলাল্লাহ

দায়ী ইলাল্লাহ মানে হচ্ছে, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী।

সূরা আহযাবের ৪৫ নং আয়াতের প্রেক্ষিতে ৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا **وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ**

"আল্লাহর অনুমতিক্রমে **তাঁর দিকে আহবানকারী** রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আর্থিক, শারীরিক, চিন্তাগত, পারিবারিক, সামষ্টিক, সামাজিক, বন্ধুদের দিক সহ সবধরনের শ্রম দ্বীনের পথে কাজে লাগিয়ে, তাওহীদের রিসালাতকে নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব মেহনত করেছেন, যাতে আল্লাহ তাআলার বিধান/শরীয়ত যাতে পুরো পৃথিবী জুড়ে পরিপূর্ণভাবে বিস্তৃত হয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে শাসন প্রতিষ্ঠা করলেও তার জীবদ্দশায় এই শাসন পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে দেখে যেতে পারেননি। তবে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা জানতেন যে, পুরো পৃথিবীতে তার শাসন ছড়িয়ে পড়বেই। কারণ রিসালাত সম্পর্কিত আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, তিনি ﷺ সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছে। এছাড়া মেরাজের রাত সম্পর্কিত একটি হাদীসে এসেছে:

সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা সমগ্র জমিনকে আমার জন্য সংকুচিত করলেন, তখন আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পেলাম। আমার উম্মতের রাজত্ব অদূর ভবিষ্যতে সে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যে পর্যন্ত জমিন আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছিল। (সংক্ষেপিত)

মিশকাতুল মাসাবীহ ৫৭৫০, সহীহ হাদিসে কুদসি (ইসলাম হাউস) ৯২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা জানার কারণে বেশ ভালোভাবে কৌশল সাজিয়ে প্রস্তুতি নিতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালে আঞ্চলিক রাষ্ট্র হিসেবে না গড়ে তুলে, এমনভাবে গড়ে তুললেন যা একসময় ফুলেফেঁপে সম্পূর্ণ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার শক্তি অর্জন করেছিল। এভাবেই রিসালাতকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়ে ছিলেন, তাই তার নাম হয়েছে দায়ী ইলাল্লাহ।

সিরাজুম মুনিরা

সিরাজ অর্থ প্রদীপ এবং মুনির অর্থ যা আলোকিত করে।

সিরাজুম মুনিরা অর্থ হচ্ছে,

- প্রজ্বল বাতি
- উজ্জল বাতি
- আলোকিত বাতি

এই উপাধিটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এজন্য দেয়া হয়েছে যে, যেই মানুষগুলো রিসালাতের আলোকে ঈমান গ্রহণের জন্য অপেক্ষমান, সেই মানুষদের অন্তরগুলোকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোকিত করেছেন।

জাহেলী যুগ তথা অন্ধকার যুগে মানুষের কাছে বিভিন্ন বাহ্যিক আলোর উৎস থাকলেও তাদের অন্তরে কোন আলো ছিল না; তাই সময়টাকে জাহেলী যুগ বলা হত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু এই সব মানুষদের মধ্যে এমন একটি দ্বীন এসেছিলেন, যা সেই মানুষদের অন্তরে আলো জ্বেলেছিল।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে সূর্যকে সিরাজ বলেছেন। সেই হিসেবে তিনি ﷺ সূর্যের মতন। যেমন রাতের অন্ধকারকে দূর করে দেয়, ঠিক তেমনি তিনিও জাহেলিয়াতের অন্ধকারকে দূর করে দিয়েছিলেন। নিঝুম অন্ধকার রাতে যেভাবে আমরা কোন প্রদীপের আলো দ্বারা পথ দেখতে পাই, সেভাবেই তিনি ﷺ অন্ধকার দূর করে আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথ দেখিয়ে, আমাদের বিবেক এবং অন্তরকে রিসালাতের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাই তাকে আল্লাহ তাআলা সিরাজুম মুনিরা অভিহিত করেছেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا
وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ

“হে নাবী! আমিতো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসাবে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী রূপে এবং **উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে**।”

(সূরা আহযাব ৪৫-৪৬)

আল্লাহ তাআলা এখানে এই পাচটি বিষয়কে চমৎকার সংযোগে তুলে এনেছেন। প্রথমে পূর্ববর্তী নবীদের **রিসালাত এর সাক্ষ্য** বহন করে, এর মাধ্যমে মানুষকে **সুসংবাদ** দিয়ে উৎসাহিত করে। দ্বীনের জন্য উৎসাহিত মানুষদের কিছু বিরুদ্ধচারী তৈরি হলে, সেই বিরুদ্ধচারীদেরকে **সতর্ক করে** তাদেরকেও **আল্লাহর দিকে আহবান** করে। তাদের অন্তর ঈমান এর আলোকে **আলোকিত** হবার পরে, মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করবে।

وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا

“এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে”

(সূরা আন নাসর - ২)

এভাবে ইসলাম যখন মানুষের কাছে পুরোপুরি ভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে, এটাই আছে এটাই হচ্ছে সিরাজুম মুনিরা। তিনি ﷺ আলোকিত করেছেন, মানবজাতির সামনে হকের পথকে।

মুজাক্কির

মুজাক্কির মানে হচ্ছে, যিনি আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

সূরা গাশিয়াতের ২১-২৩ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেনঃ

فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ **مُذَكِّرٞ**

“আপনি স্মরণ করিয়ে দিতে থাকুন কারণ আপনি হচ্ছেন স্মরণ করিয়ে দেওয়া ব্যক্তি।”

لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ

“আপনি তাদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নন।”

إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ

“তবে যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কুফরি করে তার কথা ভিন্ন”

এখানে মুজাক্কির অর্থ শুধুমাত্র স্মরণ করিয়ে দেয়াই নয় বারবার, অনবরত, অবিরত স্মরণ করিয়ে দিতে থাকা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে বলছেন, কাউকে জোর করে হেদায়াত দেয়া/দ্বীনে প্রবেশ করানো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার কাজ শুধুমাত্র তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া, বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া। কোন কথা খুব বেশি মানুষের কানের মধ্যে দিতে পারলে সে কথা খুব দ্রুত তার অন্তরে ঢুকবে।

বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া ব্যাপারটা হচ্ছে মুমিনদের ক্ষেত্রে। ঈমান আনার পরও আমাদেরকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে বলা হয়েছে, যেন আমাদের ঈমান সর্বদা তরতাজা থাকে। তবে যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কুফরি করবে তাদের উপরে ক্ষমতাশীল। ক্ষমতা থাকলে জিহাদের মাধ্যমে অথবা বিভিন্ন কলাকৌশলে জোর করতে পারা যাবে। কেউ যদি ঠিকমত ইসলামের দাওয়াত পায়নি অথবা ইসলাম সম্পর্কে তার ধারনা স্পষ্ট নয় তার জন্য জোর জবরদস্তি নেই, অন্য কোনো পন্থায় তাকে বোঝাতে হবে। তবে, কেউ ইসলামকে সত্য জানার পরেও, অবাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ না করলে তার ব্যপারে জোরজবরদস্তি করে ইসলাম গ্রহণ করাতে হবে। হাদীসে এসেছে:

ইবনু ’উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর পক্ষ হতে আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা এ কথা স্বীকার করে সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা’বূদ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রসূল এবং সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ক্বায়িম করবে ও যাকাত আদায় করবে- ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। যখন তারা এরূপ কাজ করবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী কেউ যদি কোন দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে, তবে সে দণ্ড তার ওপর কার্যকর হবে। তারপর তার অদৃশ্য বিষয়ের (অন্তর সম্পর্কে) হিসাব ও বিচার আল্লাহর ওপর ন্যাস্ত।
সহীহ : বুখারী ২৫, মুসলিম ২২, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৭৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫১৪১।

মুজাম্মিল

الْمُزَّمِّلُ শব্দের অর্থ: চাদরাবৃত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার ওহীপ্রাপ্ত হবার সময়, হেরা গুহা হতে জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখে প্রচন্ড ভয় পেয়ে যান। হেরা গুহা হতে ফিরে খাদীজাহ্ (রাযিঃ) এর নিকট এসে বললেন, “তোমরা আমাকে চাঁদর দ্বারা ঢেকে দাও, তোমরা আমাকে চাঁদর দ্বারা ঢেকে দাও। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে চাঁদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তার ভীতি দূর হল।” এরপর তিনি ﷺ চাদরাবৃত থাকাকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আবার আসেন। এবার তিনি এসে গায়েবী আওয়াজ থেকে সূরা মুজাম্মিল এর প্রথম দিকের আয়াতগুলো পাঠ করলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ
قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا
نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا

“হে চাদরে আবৃত!
রাত জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত।
অর্ধ রাত কিংবা তদপেক্ষা কিছু কম।
অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।”

মুদ্দাসসির

মুদ্দাসসির অর্থ হচ্ছে বস্ত্রাবৃত।

সহীহ বুখারীতে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (...) হযরত জাবির (রাঃ) বলেছিলেনঃ (...) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ “আমি হেরা পর্বতের গুহায় আমার প্রতিপালকের ধ্যান করছিলাম। সেখান হতে অবতরণ করে আমি শুনতে পেলাম যে, কে যেন আমাকে ডাকছে। আমি আমার সামনে পিছনে ডানে এবং বামে তাকালাম, কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলাম না। আমি তখন মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে তাকালাম তখন কিছু একটা দেখতে পেলাম। আমি তখন হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কাছে আসলাম এবং তাকে বললামঃ আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর এবং আমার উপর ঠাণ্ডা পানি ঢালতে থাকো। হযরত খাদীজা (রাঃ) তাই করলো এবং ঐ সময়। يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَاَنْذِرْ - وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ “একদা আমি চলতে রয়েছি, হঠাৎ আকাশের দিক হতে আমার কানে একটা শব্দ পৌঁছলো! চক্ষু উঠিয়ে দেখলাম যে, হেরা পর্বতের গুহায় যে ফেরেশতা আমার নিকট এসেছিলেন তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে রয়েছেন। আমি ভয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ি এবং বাড়ী এসেই বলিঃ আমাকে বস্ত্রদ্বারা আবৃত করে দাও। আমার কথামত বাড়ীর লোকেরা আমাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে। তখন يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَاَنْذِرْ হতে فَاهْجُرْ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।”

(তাফসির ইবনে কাসির ১-১০ নং আয়াতের তাফসীর অংশে)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ
قُمْ فَأَنذِرْ
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ
وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ

“হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!
উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর।
এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।
তোমার পরিচ্ছদ পরিস্কার রাখ।
অপবিত্রতা (মূর্তি) হতে দূরে থাক।”

কুরাইশরা আল্লাহর যে কোন ইবাদত করার জন্য কাবায় চলে যেত এবং সেখানে তারা মূর্তিপূজাও করত। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে কাবায় যেতে নির্দেশ দিয়েছেন আবার একই সময়ে কাবায় অবস্থিত মূর্তিগুলোও থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল; একই সাথে আল্লাহর স্মরণ করতে/ইবাদাত করতে হবে, আবার কাবার মূর্তি কিভাবে দূর করা যায় তাও ভাবতে হবে। এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাত শুরু হয়।

মুফাসসিরীনগণ বলেছেন, ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ মাধ্যমে নবুওয়াত এবং يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাত শুরু হয়। নবীগণের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের কাছে কথা পৌঁছে দেয়া আর রসূলদের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে সতর্ক করা।

রাসূল - নবী - রাসুলুল্লাহ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালাত সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে নামগুলো পেয়েছেন তা হচ্ছে রাসূ, নবী, রসূলুল্লাহ।

রসূল এবং রসুলুল্লাহ এর মধ্যে তফাৎ নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে রিসালাত পৌঁছে দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত যিনি তিনিই রসূল। রসূলুল্লাহ হচ্ছে আল্লাহর একনিষ্ঠ একজন রসূল, যিনি খাস। অর্থের দিক দিয়ে কিছুটা গভীরতা সম্পন্ন।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিসালাত দিয়েছিলেন সেই রিসালাতের পরিধি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, সূরা আরাফের ১৫৮ আয়াতে:

ٱلَّذِى لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحۡىِۦ وَيُمِيتُۖ فَـَٔامِنُواْ **قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا** بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلۡأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ

“বলঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নাবীর প্রতি ঈমান আন। যে আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে।”

সূরা নিসার ৭৯ নং আয়াতে,

مَّآ أَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفۡسِكَۚ **وَأَرۡسَلۡنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولٗاۚ** وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا

“তোমার নিকট যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহর সন্নিধান হতে এবং তোমার উপর যে অকল্যাণ নিপতিত হয় তা তোমার নিজ হতে হয়ে থাকে, এবং **আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর জন্য রাসূল রূপে প্রেরণ করেছি**; এবং আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট।”

সূরা তাওবার ৩৩ নং আয়াতে,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ

"সেই আল্লাহ এমন যে, তিনি **নিজ রাসূলকে হিদায়াত (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন**, যেন ওকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।"

সূরা আস সফের ৯ নং আয়াতে,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ

"তিনিই তাঁর **রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত এবং সত্য দীনসহ** সকল দীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের রিসালাতকে বিভিন্নভাবে মানুষের কাছে বুঝিয়েছেন। এছাড়া, অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূল শব্দদুটিকে একসাথে এনেছেন। সূরা আরাফের ১৫৮ নং আয়াতে,

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحۡىِۦ وَيُمِيتُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلۡأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ

"বলঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সেই **বার্তাবাহক নিরক্ষর নাবী**র প্রতি ঈমান আন। যে আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে।"

এখানে রসূল এবং নবী এই দুটি শব্দই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ব্যবহার করেছেন। নবী ও রসূল শব্দটির মূল অর্থ একই হলেও সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। নবী হলেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে ওহী পাঠান যা তিনি আগে জানতেন না এবং সেটা তিনি মানুষদেরকে জানিয়ে দেন। আর, রসূল হচ্ছেন, যিনি নতুন প্রেক্ষাপটে নতুন শরীয়ত ও নতুন নবুওয়াত নিয়ে আসেন।

এককথায়, রসূল নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন এবং নবী আগের কোনো রসুলের দাওয়াতকে প্রচার-প্রসার করেন। আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একইসাথে পূর্ববর্তী নবীদের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন একটি শরীয়ত নিয়ে এসেছেন, তাই তিনি নবী এবং রাসূল।

খাতামুন নাবিয়্যিন

খাতামুন নাবিয়্যিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশেষণ। কারণ অন্যান্য নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা রিসালাতকে পরিপূর্ণতার সাথে দেননি, তাদেরকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি উম্মতের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগত-অনাগত সকল মানবজাতির জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। এছাড়া আগেকার নবীদের জন্য সকল বিধান জায়েজ ছিল না। যেমন মুসা এবং ঈসা আলাইহিমুস সালামের জন্য জিহাদ নিষিদ্ধ ছিল। আবার ইউনুস আলাইহিস সালাম এর জন্য হিজরত উন্মুক্ত ছিল না। কিছু নবীদের জন্য গনিমতের মাল হালাল ছিল না। এভাবে দেখা যায়, কিছু বিষয় কোন নবীকে দেয়া হয়েছে এবং কিছু বিষয় দেয়া হয়নি। একমাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে সবকিছু পূর্ণাঙ্গভাবে দেয়া হয়েছে। তিনি হিজরত, গনিমতের মাল হালাল, রাজত্ব কায়েম, জিহাদ এগুলো সব পেয়েছেন এবং জিন ও মানুষসহ সৃষ্টিজগতের সকলের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। এজন্য তাঁকে খাতামুন নাবিয়্যিন বলা হয়।

সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেনঃ

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নি‘আমত সম্পূর্ণ করলাম; আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” (আংশিক)

সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا

“মুহাম্মাদ (সাঃ) তোমাদের মধ্যেকার কোন পুরুষের পিতা নয়, কিন্তু (সে) আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাতা।”

নির্ভরযোগ্য সনদে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেন-

أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ

“আমি রাসূলগণের সরদার; কোনো গর্ব নয়। আমি সর্বশেষ নবী; কোনো গর্ব নয়। আমি সর্বপ্রথম সুপারিশকারী; কোনো গর্ব নয়। সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই কবুল করা হবে; কোনো গর্ব নয়।”

-সুনানে দারেমী, খ. ১, পৃ. ২৪৩ (ফাতহুল মান্নান) হাদীস ৫১

হাদি

হাদি অর্থ হচ্ছে পথপ্রদর্শক। সূরা তাওবার ৩৩ নং এবং সূরা আস সফের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেনঃ

وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ **بِٱلۡهُدَىٰ** هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ

"তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন **হিদায়াত** এবং সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"

সূরা ফাতহ এর ২৮ নং আয়াতে,

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا

"তিনি তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

মানুষের হেদায়েতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালাম অত্যন্ত বেশি আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন এবং বেশি কষ্ট করতেন। তার নিজের চাচা আবু তালিবের হেদায়েতের জন্য তিনি অত্যন্ত কষ্ট করেছেন। মদিনার অনেক দূরে কোথাও কোন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি কিন্তু মুমূর্ষ অবস্থায় মারা যাচ্ছে, এভাবে শুনতে পেলে ছুটে গিয়ে দ্বীন ইসলামে আসার জন্য আহ্বান করতেন। তিনি মানুষকে দ্বীন ইসলামে আসার জন্য এত বেশি আকাঙ্ক্ষা করতেন যে, একসময় আল্লাহ তাআলা তাকে সূরা শুয়ারা এর ৩ নং আয়াতে বলেছেন:

لَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ

"তারা মু'মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়ত মনকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।"

সূরা কাহাফের ৬ নং আয়াতে এসেছে,

فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا

তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।"

রাসুলুল্লাহ সাঃ মানুষের হেদায়েতের জন্য এত বেশি উদগ্রীব থাকতেন, কেননা তিনি ছিলেন হাদি।

নুর

নূর অর্থ জ্যোতি বা আলো।

দীর্ঘ প্রায় ৬০০ বছর জাহেলিয়াতের যুগ চলমান থাকার পড়ে, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির উপর রহমতের দৃষ্টি দিয়েছিলেন। মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে যদি আল্লাহ কোন নবী প্রেরণ না করতেন, মানুষকে অহীর জ্ঞান থেকে দূরে রেখে যদি অশিক্ষিত করে রাখতেন, তাহলে তাওহিদ, আখেরাত, রিসালাত এসব বিষয় মানুষের অজানাই থেকে যেত। মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে কোন কিছুর প্রতি আচ্ছন্ন হয়ে সেটার পূজা শুরু করত, যেমনটা পৌত্তলিকদের দেখলে বোঝা যায়। ফলে মানুষ তার প্রকৃত স্রষ্টাকে ভুলে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই ছিল ইবাদত তথা নিজ স্রষ্টাকে চিনতে পারা। সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকেই মানুষ দূরে চলে যেত এবং শয়তান সফল হত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন, মানুষ স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হয়েও নিজের বুদ্ধি বিবেক ব্যবহার করি নিজ স্রষ্টাকে চিনবে। এর জন্য আল্লাহ তাআলা কিছু উপাদান, ওয়াসিলা, সাহায্য হিসেবে মানুষকে বেশ কিছু উপাদান উপহার দিয়েছেন; রিসালাত, নবী-রাসূল, কিতাব, স্বপ্নে দেখা, বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা এসব। এই হিসেবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ সকল নবী রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর। যেই নূর মানুষকে অন্ধকার ও কুসংস্কার থেকে বের করে দ্বীনের আলোতে নিয়ে আসবে।

মানুষের ইবাদতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা সর্বপ্রথম যে গৃহ তথা কিবলা সৃষ্টি করেন সেটি আরবের মক্কাতে ছিল, বিধায় আল্লাহতালা সর্বশেষ নুর, যা সম্পুর্ণ মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরবেই প্রেরণ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আলে ইমরানের ৯৬ নং আয়াতে বলেন:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعٰلَمِينَ

“নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা বাক্কায় (মাক্কায়) অবিস্থত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক।”

এ কারণেই সর্বপ্রথম ইবাদত গৃহ তথা পৃথিবীর কেন্দ্র যেহেতু মক্কায়, তাই সর্বশেষ নুর যা সকল মানুষের জন্য, তা সেখানেই প্রেরণ করে পৃথিবীকে আলোকিত করলেন। আল্লাহ তায়ালা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূর বলে, সূরা মায়েদা ১৫ নং আয়াতে বলেছেন:

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖۚ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ

“হে কিতাবধারীগণ! তোমাদের কাছে আমার রসূল এসে গেছে, সে তোমাদেরকে অনেক বিষয় বর্ণনা করে কিতাব থেকে যা তোমরা গোপন করতে আর অনেক বিষয় উপেক্ষা করে। তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে।”

সূরা আহযাবের ৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

“আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।”

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, আল্লাহ তা'আলা সিরাজুম মুনিরা তথা উজ্জ্বল বাতি বা নুর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নুরের বাহক, সেই হিসেবে তিনি নিজেও নুর। এ ব্যাপারে সাহাবীগণ সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, “রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসলেন, তখন মদিনার প্রত্যেকটি জিনিস আলোকিত হয়ে গিয়েছিল; যা আমরা আগে অন্ধকার দেখতাম।” এগুলো আসলে রূপক অর্থেই তারা বলেছেন। *হাদীসটি ইমাম আহমদ তিরমিজি ইবনে মাজাহ এনেছেন।*

সাহাবীরা আরো অনেক বক্তব্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুর হিসেবে অভিহিত করেছেন। এগুলো প্রত্যেকটি উপমা হিসেবে বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাঁদের সাথে এবং সূর্যের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রিসালাতের কারনেই নুর ছিলেন, শারীরিকভাবে নূরের দ্বারা সৃষ্টি নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তার ঈমান আমল অনুযায়ী নুর রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে, ঈমানকে নুর হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। সে কুরআন ও ঈমান ওয়ালাদের মধ্যেও এই নূর এর প্রভাব থাকে। সূরা নিসার ১৭৪ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرۡهَٰنٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ نُورٗا مُّبِينٗا

“হে মানবমন্ডলী! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের কাছে উজ্জ্বল প্রমাণ এসে পৌঁছেছে, আর আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।”

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সমগ্র মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ ঈমানের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি নিজেই কুরআনের ধারক-বাহক ছিলেন, তাই তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই নুর ছিল; ঈমানের নুর, রিসালাতের নুর, যুহদ বা আল্লাহ ভীতির নুর।

মুবিন

মুবিন অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী।

সূরা হিজর এর ৮৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَقُلۡ إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلۡمُبِينُ

“আর বল, নিশ্চয় আমিই সুস্পষ্ট সতর্ককারী।”

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম যেহেতু ইয়া’মুর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতেন, তাই এগুলো তিনি সুস্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা সূরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াতে বলেছেন:

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

“যারা প্রেরিত উম্মী নাবীকে অনুসরণ করবে যা তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে তারা লিখিত পাবে। সে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে, পবিত্র বস্তুসমূহ তাদের জন্য হালাল করে, অপবিত্র বস্তুগুলো তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে, তাদের থেকে গুরুভার সরিয়ে দেয় আর সেই শৃঙ্খল (হালাল-হারামের বানোয়াট বিধি-নিষেধ) যাতে ছিল তারা বন্দী। কাজেই যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে আর তার উপর অবতীর্ণ আলোর অনুসরণ করে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।”

এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট করে সব কিছু বলতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো কথা বলতেন, তা এমন স্পষ্টভাবেই বলতেন যে, মানুষ এর কাছে আর কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব বা প্রশ্ন থাকত না।

এবং সেই একই আয়াতে আল্লাহ তাআলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরো একটি বৈশিষ্ট্য বলেছেন, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ অর্থাৎ জাহেলী যুগের যেসকল শৃংখল তোমাদের গলায় আটকে ছিল, সে সকল বোঝায় তোমাদের পিঠ ভারী করে রেখেছিল, সে সকল বিষয়গুলো এই রাসুল তোমাদের কাছ থেকে খুলে নামিয়ে দিয়েছেন যাতে তোমরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারো। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবকিছুই সুস্পষ্টভাবে পরিপূর্ণ করতেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, “ওই কাজকে আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন যে কাজ শুরু করার পর বান্দা পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করে। “

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শরীয়তকে এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা চৌদ্দশ বছর পরে এসেও নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কোরআন হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে খুঁজে পাই।

খুলুকে আজিম

খুলুকে আজিম মানে হচ্ছে উত্তম চরিত্র। আল্লাহ তাআলা সূরা আল কালাম এর ৪নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী আখ্যায়িত করে বলেছেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।"

এখানে আল্লাহ তাআলা আজিম শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা কেবল সুবিস্তৃত বা প্রশস্ত কোন বিষয়ের ক্ষেত্রেই কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ তা'আলার তৌফিক এর মাধ্যমে সমস্ত সুন্দর চরিত্র গুলিকে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। এই সিফাতটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে ধৈর্য্য ও সহ্য ক্ষমতা খুব বেশি ছিল বলে।

উত্তম চরিত্রের সকল কিছুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে পাওয়া যায়, তাই আল্লাহ তা'আলা এই বিস্তৃত গুণাবলীর কারণে তাকে খুলুকে আজিম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শয়তান যেমন স্বভাবতই সকল ভালোর বিরুদ্ধে খারাপ কিছু দাঁড় করানোর চেষ্টা করে, তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম চরিত্রের বিপরীতেও বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য কিছু শত্রু তৈরি করেছিল। এই সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কঠিন অবস্থান গ্রহণ করতে হয়েছে। এই শয়তানদের বিরুদ্ধে কঠিন হয়ে শক্ত অবস্থান নেয়াটাও তার চরিত্রের একটা অংশ। এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করেছেন।

ইমাম জুনায়েদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিপূর্ণ ব্যস্ততাই ছিল আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা। তিনি যখন যা করতেন সবগুলো আল্লাহর নির্দেশ ক্রমেই করতেন। তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করতেন। তিনি যদি কাউকে কোন কঠিন কথা বলে থাকেন সেটাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কারো বিরুদ্ধে তলোয়ার তুলে থাকলে সেটাও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। আল্লাহর রাস্তায় তিনি এই বিষয়গুলো ব্যয় করেছেন।

আল্লাহ তাআলা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিপূর্ণ ইলম এবং পরিপূর্ণ চরিত্র দান করেছিলেন, এ কারণে তার নাম হয়েছে সহিবু খুলুকিল আজিম বা সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।

অনেকে বলে থাকেন অন্যান্য সকল নবীগণের মধ্যে যেসব উত্তম চরিত্র ছিল, সবগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই ধারণ করেছেন, তাই তাকে খুলুকে আজিমের অধিকারী বলা হয়।
এছাড়া আরো কিছু আলেম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেরাজের রাত্রে আল্লাহ তায়ালার দরবারে যান, তখন তার সামনে সমস্ত জগতের মালিকানা উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং গ্রহণ করার জন্য তাকে বলা হয়েছিল। (যেমনটা হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাকে পুরো জগতের সম্পদগুলোর চাবি দেওয়া হয়েছে") কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছিলেন, আমি একজন গরীব নবী হিসেবে জীবন-যাপন করতে চাই। এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর বিলাসিতা, সমৃদ্ধি, ধনাঢ্যতাকে গ্রহণ করেননি এজন্য তাকে খুলুকে আজিমের অধিকারী বলা হয়।

দয়ালু দয়াময়

আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবার ১২৮ নং আয়াতে বলেছেন:

لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ

"তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ।"

রউফ এবং রহিম শব্দদুটো কুরআনে সাধারণত আল্লাহ তায়ালার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। শুধুমাত্র এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ব্যবহার করেছেন এটা বোঝানোর জন্য যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তরে মানবজাতির জন্য যে দয়া এবং মায়া তা চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল এবং সমস্ত মানবজাতির সম্মিলিত দয়াকে লঘু করে দেয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে দয়ালু ও দয়াময় হিসেবে অভিহিত করেছেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের তুলনা সবচেয়ে বেশি দয়াময় ছিলেন। অন্যান্য নবীগণ মানুষদের দেয়া যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে সহ্য করতে না পেরে আল্লাহর নিকট সেসব উম্মতদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মানুষ তো দূরে থাক নিজ, বংশের মানুষদের

থেকেই অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছিলেন, তবুও তাদের বিরুদ্ধে একশন না নিয়ে বরং দোয়া করেছিলেন। যেমন,

“তিনি ﷺ এই আশায় তায়েফ গমণ করলেন যে, তায়েফবাসী হয়ত তাঁকে আশ্রয় দিবে এবং সাহায্য করবে। তায়েফ গিয়ে তিনি সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করলেন। কিন্তু তিনি সেখানে কোন সাহায্যকারী পেলেন না এবং তাকে কেউ আশ্রয়ও দিল না। এমনকি একজন লোকও তাঁর দাওয়াত কবুল করল না। বরং তারা তাঁকে আরও বেশী কষ্ট দিল। এত কষ্ট তিনি ইতিপূর্বে তাঁর জাতির লোকদের থেকেও ভোগ করেন নি। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরই মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারেসা। রসূল (ﷺ) তায়েফে দশ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি তায়েফের সকল গোত্রীয় সর্দারদের কাছে গমণ করেন এবং প্রত্যেককে দ্বীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু সবাই একই কথা বলল যে, তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও। শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হয় নি; বরং তারা দুষ্ট বালকদের তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। ফেরার পথে তায়েফের মূর্খ ও দুষ্টরা তাঁর পিছে লাগল। তারা আল্লাহর রসূলকে গালি দিচ্ছিল, তাঁর পিছনে হৈ চৈ করছিল এবং পাথর নিক্ষেপ করছিল। পাথরের আঘাতে তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরে পায়ের জুতা দু’টি লাল হয়ে গেল। যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) প্রিয় নাবীকে রক্ষা করছিলেন। একটি পাথর এসে তাঁর মাথায় লেগে গেল। এতে তাঁর মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। (...)

ফেরার পথে আল্লাহ তা’আলা তাঁর কাছে পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিস্তা প্রেরণ করলেন। ফিরিস্তা তাঁর কাছে তায়েফবাসীদের উপর মক্কার বড় দু’টি পাহাড় নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার অনুমতি চাইলেন। উত্তরে নাবী (ﷺ) বললেন বরং আমি চাই আল্লাহ তাদের বংশধর হতে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা।”

এ থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত বেশী দয়াদ্র ছিলেন যে, খোদ তাকে হত্যা করতে আসা মানুষদেরকেও তিনি ক্ষমা করেছেন এবং উল্টো তাদের জন্য দোয়া করেছেন। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন দয়া দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। কেননা তিনি যেহেতু পুরো মানব জাতির উপর কঠিন দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন তাই তার অন্তরে ততটাই বিস্তৃত দয়া থাকা দরকার।

আল্লাহ তাআলা সূরা হুজরাতের ৭ নং আয়াতে বলেছেন:

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِۚ لَوۡ يُطِيعُكُمۡ فِي كَثِيرٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ لَعَنِتُّمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمۡ وَكَرَّهَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ

“তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিলে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং উহা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। ওরাই সৎ পথ অবলম্বনকারী।”

যেমন, সাহাবীরা এসে যদি বলতো আমরা মিসওয়াক অত্যন্ত পছন্দ করি, আপনি মেসওয়াককে দ্বীনের অংশে পরিণত করে দিন। তখন তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেনে নিলে, আমাদের যে ভাবে ওযু বাধ্যতামূলক সেভাবে মেসওয়াকও বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা উম্মতের উপর অতিরিক্ত কষ্ট যেন না হয় সেই ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমাকে যখন কোন দুটি জিনিসের একটি পছন্দ করতে দেয়া হতো, আমি তখন এর মধ্যে সবথেকে সহজটাই পছন্দ করতাম এবং আমার উম্মত যাতে কষ্টে না পড়ে এই চিন্তা আমি সবসময় করি।”

এই কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ হতে আবেদন করতে করতে পাঁচ ওয়াক্ত নিয়ে এসেছেন। এই বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতে বলেছেন:

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ

“সুতরাং আল্লাহর পরম অনুগ্রহ যে তুমি তাদের উপর দয়ার্দ্র রয়েছ, এবং যদি তুমি রূঢ় মেজাজ ও কঠিন হৃদয় হতে তবে অবশ্যই তারা তোমার নিকট হতে সরে যেত। সুতরাং তাদের দোষ ক্ষমা কর এবং আল্লাহর কাছে তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চাও এবং কাজ-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর যখন (কোন ব্যাপারে) সংকল্পবদ্ধ হও, তখন আল্লাহরই প্রতি ভরসা কর; নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে পছন্দ করেন।”

আমানত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি অর্পিত প্রত্যেক দায়িত্ব সততা, আমানত ও ইখলাসের সহিত পালন করতেন। তিনি মানুষকে হেদায়েতের পথ দেখানোর ক্ষেত্রে কখনো বিভেদ বৈষম্য করেননি। তিনি ছিলেন মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ। এই জন্যই তিনি রিসালাতের আমানতকে পরিপূর্ণভাবে পালন করতে গিয়ে আপন-পর, পরিচিত-অপরিচিত, আরব-অনারব, ধনী-গরিব, চাকর-মনিব সবার জন্য সমান ভাবে হেদায়েতের দোয়া ও চেষ্টা করেছেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন খাদিম ছিল; এক ইহুদি বালক। বাচ্চাটা কয়েকদিন না আসায় তিনি ﷺ খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, বাচ্চাটি খুব অসুস্থ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গিয়ে পৌঁছানো মাত্রই দেখতে পেলেন, বাচ্চাটির সাকরাতুল মাউত বা মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বুঝতে পারলেন, বাচ্চাটি কিছুক্ষণ পর হয়তো মারা যাবে। বাচ্চাটিকে এখন ইসলাম গ্রহণ করানো গেলে তার পরকালটা শান্তির হবে। তখন সেই বাচ্চাকে তিনি লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলতে বললেন। বাচ্চাটি তার বাবার দিকে তাকাল; যে ছিল একজন ইহুদী পাদ্রী। তখন তার বাবা বলল, হ্যাঁ তুমি আবুল কাশেম যা বলছে, তা করো। অতঃপর বাচ্চাটি ইমান আনলো। এভাবে তার চাচা আবু তালেব, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর মা অসুস্থ কালেও তাদের ঈমানের জন্য তিনি ছুটে গিয়েছিলেন। যখনই তিনি কাউকে পেতেন তাদের জন্য হেদায়েতের দোয়া ও চেষ্টা করতেন। এটাই হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতের আমানতের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা।

আল্লাহ তায়ালা সূরা নাজম এর শুরুর দিকে বলেছেন:

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ

“তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,
এবং সে মনগড়া কথাও বলেনা।
এটাতো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।”

এ থেকে বোঝা যায় , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে যা কিছু বলেন, এগুলো আল্লাহর নির্দেশেই বলেন। তিনি কিছু বলার আগে আল্লাহর নির্দেশনার জন্য একটু চুপ থাকতে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলার অনুমতি পেতে তখন বলতেন। এভাবেই তিনি আমানতকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করেছেন।

লজ্জাশীল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। সাহাবীগণ সাক্ষী দিচ্ছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুমারী নারীদের মতোই লজ্জাশীল ছিলেন। মাঝে মাঝে এমন হতো যে, আমরা দেখতে পেতাম লজ্জায় তার গাল লাল হয়ে যেত।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। মাঝেমধ্যে তাদের সাথে থাকা কালীন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরনের কাপড় তার গোড়ালির সামান্য উপরে উঠে থাকতো, এটাকে তিনি বেশি গ্রাহ্য করতেন না যেহেতু এটা সতর এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসতেন তিনি সেই অংশটুকু ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করতেন কারণ তিনি নিজের জামাতাদেরকে খুব বেশি লজ্জা পেতেন। এই বিষয়ে সাহাবারা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কেন উসমানকে এত বেশি লজ্জা পান? তিনি এর উত্তরে বলেন, " উসমানের সাথে ফেরেশতারা থাকে। আমি উসমান এর সাথে ফেরেশতাদেরকে প্রবেশ করতে দেখি, একারণে আমি খুব বেশি লজ্জা বোধ করি।"

সূরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ
فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ
وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ
وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا

"হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই আহারের জন্য নাবী-গৃহে প্রবেশ করনা। তবে তোমাদেরকে আহবান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং আহার শেষে তোমরা চলে যেও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নাবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেননা। তোমরা তার স্ত্রীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।"

এ থেকে বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে লজ্জাবোধ অত্যন্ত বেশি ছিল যে, এজন্য আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন।

আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, "প্রতিটি ধর্মের বিশেষ একটি স্বভাব আছে। আর ইসলাম ধর্মের বিশেষ স্বভাব হল লজ্জা।"

(মুয়াত্তা মালিক)

এছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর একটি হাদিসে বলেছেন, "লজ্জা শুধু কল্যাণই বয়ে আনে।" *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেছেন: “নিশ্চয়ই মানুষজন পূর্ববর্তী নবীদের থেকে যে একটি জ্ঞান পেয়েছে সেটা হচ্ছে, যখন তোমার কোন লজ্জা থাকবেনা তখন তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পারো।”
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলেছেন: “কোন কিছুতে যখন অশ্লীলতা থাকে তখন সেটা কলুষিত হয়ে যায়। আর যখন কোন কিছুতে লজ্জাবোধ থাকে, তখন তার মধ্যে সৌন্দর্যমন্ডিত একটি ভাব তৈরি হয়।”
এ থেকে বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন।

অটল অবিচল

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি গুণ হলো অটল অবিচল থাকা। যেকোনো ধরনের সহজ কিংবা কঠিন সকল মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যের উপর তার কাজের প্রতি অটল থাকেন। আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতে বলেছেন:

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ

“অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত হত। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ কর; অতঃপর তুমি যখন সংকল্প কর তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীগণকে ভালবাসেন।”
তাই দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কাজ নামতেন সেটিকে জোরদার ভাবি শ্রম দিতেন এবং সবসময় নসিহত এবং হিকমত অবলম্বন করতেন।
যখন ওহুদের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শত্রুরা ঘিরে ফেলে ছিল এবং মুসলিমরা ভুলবশত সরে গিয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অবস্থান থেকে একবিন্দুও নড়েননি। যেখানে ছিলেন সেখানেই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন এবং সেখান থেকে সাহাবীদের ডাক দিচ্ছিলেন, “তোমরা ফিরে আসো এবং যুদ্ধে আবারও প্রত্যাবর্তন করো।”
এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময়ই অটল-অবিচল ছিলেন।

কোরআনে বর্ণিত রাসূলুল্লাহর ﷺ বৈশিষ্ট্য

সুভাষী

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুভাষী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে কথা বলতেন। সূরা আলে ইমরানের ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেনঃ

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ

"অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং **তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত হত**। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ কর; অতঃপর তুমি যখন সংকল্প কর তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীগণকে ভালবাসেন।"

আল্লাহর এ আদেশের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা সুন্দর ভাষায় মানুষের সাথে কথা বলতেন। তার সাথে কেউ খারাপ আচরণ করলে এর বিপরীতে তিনি ভাল আচরণ করতেন। জন্য সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেনঃ

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ

"তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে। তোমার রাব্ব ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সৎ পথে আছে।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুমিষ্টভাষার অধিকারী ছিলেন। তার কথাগুলো মানুষের অন্তরে গিয়ে মর্মস্পর্শ করতো তাই সাহাবারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেই কথা শুনত।

যুহদ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল যুহদ বা দুনিয়া বিমুখতা। দুনিয়াবিমুখ হওয়া এবং বেশি বেশি ইবাদত করা হল নবীদের সিফাত। হাদিসে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরো পৃথিবীর চাবিকাঠি দেয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি সেগুলো গ্রহণ না করে বলেছিলেন, "আমি একজন দরিদ্র নবী হিসেবে বেঁচে থাকতে চাই।" আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, "রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ইন্তেকালের পর আমার ঘরে খাওয়ার মত এমন কিছুই ছিল না যা কোন একটি প্রাণী কিছু খেতে পারে। শুধুমাত্র

একটি থলের মধ্যে কিছু যব ছিল, সেই যবগুলো দিয়ে আমি বেশ কয়েক দিন অতিবাহিত করেছিলাম।”

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের সময় তার কিছু কর্য ছিল। অবশিষ্ট মাত্র কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তা পরিশোধ করেন।

দ্বীনের পথে ব্যয় এর জন্য যখন যেটুকু দরকার ছিল তা আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা সেটুকুর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যেমন নবুওয়াতের প্রথম দিকে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সম্পদ দ্বারা প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন। মদিনায় পৌঁছানোর পর মুহাজিরীনরা খুব দরিদ্র ছিল, এই অবস্থায় অবস্থায় জিহাদ ফরজ হলে, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সাহাবীদের সদকার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সে প্রয়োজন মিটিয়েছেন। আবুবকর তার সম্পূর্ণ সম্পদ, ওমর তার অর্ধেক সম্পদ এবং ওসমান একাই ৮-৯টা যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করেছিলেন। এভাবে প্রয়োজনের সময় আল্লাহ তাআলা সম্পদের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যে একজন নবীকে ধনী হতে হবে এমনটা নয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহদ অবলম্বন করতেন তথা দুনিয়াবিমুখ জীবনযাপন করতেন, যাতে কঠোর ইবাদতের দ্বারা আল্লাহর কথা সব সময় স্মরণ থাকে।

সূরা মুজাম্মিল এর ২০ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেনঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗاۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمُۢ

“তোমার রাব্বতো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সংগে যারা আছে তাদের একটি দলও এবং আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারনা, অতএব আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হয়েছেন। অতএব কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর; আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেহ কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। অতএব কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং

পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি ইবাদত করতেন যে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা সূরা তোয়াহার ২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ

“তোমাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।”

মহানুভবতা:

মহানুভবতার মধ্যে একটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতার ব্যাপারটি। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন এবং রমজানে আরো বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন।”

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই উদারতা ও মহানুভবতা সম্পর্কে আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন: আমি ১০ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছি। আমার কোন কাজ তিনি আপত্তি করে কখনো বলেননি, “তুমি এমন কেন করলে?” বা “এমন কেন করনি?”

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে একদিন তিনি ﷺ এক কাজে পাঠালেন। শিশু আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বেরিয়ে দেখলেন অন্যান্য বাচ্চারা খেলছে, তখন তিনি কাজের কথা বেমালুম ভুলে নিজেও খেলতে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন আনাস রা: ফিরে আসছে না, তখন তিনি বের হয়ে কিছুদূর গিয়ে দেখলেন যে আনাস বাচ্চাদের সাথে খেলছে। তখন তিনি ﷺ পেছন থেকে এসে বললেন, “আমিও তোমাদের সাথে খেলবো।”

এভাবেই তিনি বাচ্চাদের লালন-পালনের উত্তম আদর্শ দেখিয়েছিলেন।

খাদিজা রা:, যায়েদ ইবনে হারেসাকে কিনে এনেছিলেন। যায়েদ তখন ছোট বাচ্চা ছিল। এরপর খাদিজা রা: এর সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিয়ে হলে, যায়েদকে তিনি নিজের পুত্র সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন। কাবার সামনে দিয়ে গিয়ে ঘোষণা দেন, “আজকে থেকে যায়েদ আমার সন্তান। সে আমার কাছ থেকে উত্তরাধিকারী হবে।”

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একবার আবু তোফায়েল এবং তার সঙ্গীরা এসে বলল, ইয়েমেনের দাউস গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং কুফরি করেছে। আপনি তাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করুন। উপস্থিত লোকেরা তৎক্ষণাৎ বদদোয়া শুরু করল, "দাউস এর লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাক।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন যে, "না, বদদুয়া না। বরং তাদের জন্য দোয়া করে বল, হে আল্লাহ আপনি দাউস গোত্রের লোকদের ঈমান দিন এবং তাদেরকে আমার কাছে এনে দিন।"
এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই মহানুভবতা দেখিয়েছেন।

হাসিখুশি

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় সাহাস্য থাকতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালামকে অট্টহাসি দিতে দেখিনি তবে সব সময় তার সামনের দু-পাটি দাঁত দেখা যেত" অর্থাৎ সব সময় তিনি মুচকি হাসতেন।

অমায়িক শ্রোতা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চমৎকার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি খুব সুন্দর অমায়িক একজন শ্রোতা। বেশিরভাগ সময়ই সাহাবারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে শুনতে আসতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও যে একজন সুন্দর শ্রোতা ছিলেন, তা আমরা সূরা তাওবার ৬১নং আয়াতের দ্বারা বুঝতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেনঃ

وَمِنۡهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌۚ قُلۡ أُذُنُ خَيۡرٖ لَّكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤۡمِنُ لِلۡمُؤۡمِنِينَ وَرَحۡمَةٞ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡۚ وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ

"তাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা নাবীকে কষ্ট দেয় আর বলে তিনি কান কথা শুনেন। বল, 'তোমাদের যাতে ভালো আছে সে তাই শোনে'। সে আল্লাহয় বিশ্বাস রাখে, আর মু'মিনদেরকেও বিশ্বাস করে, আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য রহমত। অপরপক্ষে আল্লাহর রসূলকে যারা কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ 'আযাব।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মজলিসে অন্য কেউ কথা বললে তখন তিনি চুপ হয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তিনি কারও কথা শুনলে সম্পূর্ণ তার দিকে ফিরে শুনতেন, তখন অন্য কোন বিষয়ে মগ্ন থাকতেন না।

পূর্ণ ইলমওয়ালা

আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা সূরা নিসার ১১৩ নং আয়াতে বলেছেন:

وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكَ وَرَحۡمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٞ مِّنۡهُمۡ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيۡءٖۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمۡ تَكُن تَعۡلَمُۚ وَكَانَ فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكَ عَظِيمٗا

“যদি তোমার প্রতি আল্লাহর করুণা এবং দয়া না হত, তবে তাদের একদল তো তোমাকে পথভ্রষ্ট করতেই চেয়েছিল; বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করে না আর তারা তোমার কিছুই অনিষ্ট করতে পারবে না, কারণ আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তোমার উপর রয়েছে আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহ।”

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনবদ্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ কারণে তার কাছ থেকে যারা ওয়ারিশ হয়েছেন তথা ইমাম বুখারী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়িম, আল্লামা সুয়ূতী, ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ সহ জগতের বড় বড় আলিমদের ইলমের অবস্থান দেখলেই বোঝা যায় তারা কত বড় জ্ঞানী ছিলেন। তারা সবাই ছিলেন নবুওয়াতি ইলমের ওয়ারিশ। তাহলে সেই ইলমের যিনি মূল তথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে কত গভীর ইলম ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।